বিনিদ্র জোনাকি

মাহমুদা মিনি

স্বরবর্ণ প্রকাশনী

বিনিদ্র জোনাকি
মাহমুদা মিনি

১ম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০২৫
প্রকাশক : এম. উসমান
স্বরবর্ণ প্রকাশনী
গাউছিয়া কমপ্লেক্স (১ম তলা), মিরপুর বাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট।
মুঠোফোন : ০১৭১৫-৭৭৪৫৭৩
ই-মেইল : sbarabarnapublications@gmail.com

স্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : সাদিত-উজ-জামান

বর্ণবিন্যাস : স্বরবর্ণ কম্পিউটার
মুদ্রণ : মশাল প্রিন্টার্স, পূর্ব জিন্দাবাজার, সিলেট।

মূল্য : ৩৪০ (তিনশত চল্লিশ) টাকা

পরিবেশক : ধ্রুপদী পাবলিকেশনস
অনলাইন পরিবেশক: রকমারি.কম, বইফেরী.কম, স্বরবর্ণ বইঘর

Binidro Jonaki
By Mahmuda Mini
1st Edition Book Fair 2025
Published in Bangladesh
By M. Usman, Shoroborno Prokashoni
Gausia Complex (1st floor) Mirpur Bazar, Habiganj, Sylhet.
Phone: 01715-774573

Price BD : 340.00 Tk (USD 12.00 $)
ISBN : 978-984-36-0555-9

"লেখক ও প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত বইয়ের কোনো অংশ পুনঃমুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না। শর্ত লঙ্ঘন হলে আইনানুগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

উৎসর্গ

খুরশিদা আক্তার রনিকে।
আমার প্রিয় বড় আপা।
উনিই আমার দেখা একজন আয়না বা বিনিদ্র জোনাকি।

অবতরণিকা

কেউ বলে নারীর জীবন সহজ-সরল। তাদের জীবনটা মৃত্যু অবধি সরলরেখায় চলে। কিন্তু এই সরল মনের নারীর জীবনের কত গল্প যে রান্নাঘরের প্রতিটা ইট-পাথর জানে, তা কি আমরা বাইরের মানুষেরা জানি? বাইরে থেকে যে ছবিটা আমরা দেখি তাই কি সব? না-কি ভেতরের দৃশ্যটা ভিন্ন?

বিনিদ্র জোনাকি উপন্যাসে মূলত ভিন্ন চরিত্র, স্বভাব এবং ভিন্ন মনের কিছু মানুষের ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছি। নারী জীবনের আঘাত, যন্ত্রণা, সুখ, প্রত্যাশা বা তাদের ত্রুটি, অভাব, সমস্যা তুলে ধরতে চেয়েছি। মানুষের বুকের একপাশে সুখ এবং আরেকপাশে দুঃখের বসবাস। যে জীবন থেকে যেটা কুড়াতে পছন্দ করে, সে সেটাই পায়। তবে এর মাঝে কেউ-কেউ ভাগ্যের রোষানলে পড়ে।

জগতের সব পুরুষ কি এক? সব পুরুষ যে এক না, বিভিন্ন বয়স, চাহিদা এবং মানসিকতার ভিত্তিতে তার চিত্রায়ণ করতে চেয়েছি। একদিকে ভীষণ দায়িত্বশীল মানুষের দেখা মিলেছে, অপরদিকে দায়িত্বহীন সত্তাও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

লোভ, হিংসা, ঘৃণা, অহংকার, পাপ মানুষকে কেমন পরিণতির দিকে টেনে নিতে পারে তা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। ভুল মানুষকে বিশ্বাস করার পরিণতির চিত্র চোখে পড়বে।

নারীর জীবন জোনাকির মত। যে শুধু জীবন-সংসারে নিঃস্বার্থভাবে আলো ছড়িয়ে যায়। সেই আলো ছড়ানোর গল্পটা সবাই দায়িত্বের কাতারে ফেলে বসে থাকে।

বিনিদ্র জোনাকির অনেক ছবি আমার ভীষণ পরিচিত, দৃশ্যগুলো আমার চোখে ভাসে। প্রতারণা আর অপূর্ণতার দৃশ্যের ওপিঠে জীবনের প্রকৃত ভালোবাসা বা পূর্ণতার গল্পও থাকে। চলুন সেই গল্পটাই পড়ে নিন।

মাহমুদা মিনি
যশোর।

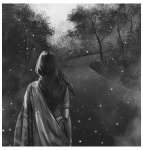

আকাশের বুকে একটা মস্ত লাল ফুলের মত সূর্য প্রস্ফুটিত হতে শুরু করেছে। চারদিকে উড়তে থাকা হালকা মেঘপুঞ্জকে পাতা বলে মনে হচ্ছে। ডিমের কুসুম আকৃতির ফুলটা ফুটে উঠেছে, সেই সাথে প্রকৃতিও গা ঝাড়া দিয়ে গতরাতের সব জড়তা দূর করে নিচ্ছে। গাছের ডালে বসে ভোরের পাখিরা গলা সেধে নিচ্ছে। প্রকৃতি এই সুযোগে পাখির কলতান আর নদীর কুলকুল ধ্বনির মেলবন্ধনে ভোরের এক স্নিগ্ধ নব্য সংগীতের জন্ম দিচ্ছে।

ভোর হলেও এখনও হাস-মুরগিগুলোকে গৃহিণীরা খোপ থেকে বেরোতে দেয়নি। অগত্যা সেগুলো বাইরে বেরোনোর জন্য প্রাণপণ ডাকছে। ভোর হলেই তারা টের পায়। সূর্যের সোনালি আলো পুরোপুরিভাবে না ছড়ালেও আন্দুল বাড়ীয়া গ্রামের মানুষগুলো ঠিকই জেগে উঠেছে, এমনকি কাজেও হাত লাগিয়েছে। পুরুষেরা গামছায় শুকনো গুড় আর মুড়ি বেঁধে নিয়ে রওনা হয়েছে। কারও-কারও হাতে আবার কাঁচি, কোদাল বা লাঙলের পাশাপাশি একটা করে ছোট কলসি দেখা যাচ্ছে। ওগুলোতে করে জমির কাছের কোনো বাড়ি থেকে পানি ভরে নেওয়া হবে। দুপুরের কাঠফাটা রোদের ভেতর তো আর পানি ছাড়া কাজ করে বাঁচা যায় না!

আয়না আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসেছে। তার পরনের ঢোলা সেলোয়ারটা হাঁটু অবধি উঠে এসেছে। অলস হাতে সেটা গোড়ালি পর্যন্ত নামিয়ে আস্তে আস্তে খাটের কোণায় সরে বসে। কিন্তু তার সাবধানতাকে রীতিমত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে খাটটা খড়মড় করে ওঠে। আয়না কপাল কুঁচকে পাশে শুয়ে থাকা ঘুমন্ত বাচ্চাটার দিকে তাকায়। বাচ্চাটা একটু নড়ে উঠেছে মাত্র। এই শব্দ ওর ঘুম ভাঙাতে পারেনি। অগত্যা সে সাবধানে খাট থেকে নেমে পড়ে। স্যান্ডেলটা পায়ে ঢুকিয়ে বুঝতে পারে তার হাঁটতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। রাতে সম্ভবত শোয়ায় কোনো সমস্যা হয়েছিল। তাছাড়া গতমাসে তার দ্বিতীয়বারের মত সিজার হয়েছে। পেটের ঘা শুকিয়ে আসলেও ভেতরের ঘায়ে প্রায়ই টান লাগে। একটা তীব্র ব্যথা পুরো পেটে ছড়িয়ে পড়ে।

সে ব্যথা অগ্রাহ্য করে টেবিলের উপর থেকে ব্রাশটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরোয়। ধীর পায়ে কলপাড়ে গিয়ে দাঁড়ায়। একটু পরই কলপাড়ের সামনের দিকে তাকায়। ওদিকে খানিকটা দূরে বহমান কাজলা নদী, সেদিকে তাকিয়েই আনমনে ব্রাশ করতে থাকে। তাকে দেখে মনে হয় মাথায় গতদিনের কোনো চিন্তা সবেমাত্র প্রবেশ করেছে।

মেয়েটার নাম আয়না। বয়স ২৫। উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। চেহারা দুধের মত ফরসা, খাড়া নাক, কটা চোখ। পিঠ ছুঁয়ে আছে সোনালি কেশগুচ্ছ। মেদহীন দেহটা মনে হয় বাতাসে উড়ে যাবে। কিন্তু পুরো গ্রামে এমন সুন্দরী মেয়ে খুব কমই আছে। মানুষের হাসিতেও যে মুক্তা ঝরে কথাটা তাকে দেখলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। হাসিখুশি প্রাণখোলা একটা মেয়ে। চট করেই মানুষের সাথে ভাব জমিয়ে ফেলতে পারে। এই স্বভাবের জন্য গ্রামের এই মাথা থেকে ঐ মাথার সব লোকই তার পরিচিত। সবাই তাকে চিনবেই বা না কেন? একটা দুরন্ত ডানা ঝাপটানো পাখিকে তো খুব সহজেই মানুষ চিনে নেয়, মনে বেঁধে রাখে!

অবশ্য তিন বছরের ভেতর দুটো বাচ্চার জন্ম দিয়ে এখন তার মায়াবী চোখ জোড়াতে ক্লান্তির ছাপ। চোখের নিচটা জুড়ে কালি লেপটে আছে। মুখটা রক্তশূন্য দেখায়। মানসিক চাপ আর পেটের ব্যথায় পিঠটাও খানিকটা সামনে ঝুঁকে এসেছে। এইচএসসি পাশ করার পর অনার্সে ভর্তি হয়েছিল। বাবার দরিদ্র সংসার এই খরচের বোঝা টানার উপযোগী ছিল না। অগত্যা সে পড়াশুনার ইতি টেনে চাকরির চেষ্টা করেছিল। ভাগ্যক্রমে একটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকরি পেয়ে যায়। কিন্তু চাকরিসূত্রে পোস্টিং হয় খুলনাতে।

খুলনাতে যাবার মাসখানেক পর এক ছুটির দিনে ক্যান্টিনে খেতে বসে তার প্রথম দেখা হয় লতিফের সাথে। লতিফও খুলনারই আরেকটা সরকারি স্কুলের শিক্ষক। তখন চাকরির বয়স ছয় বছর চলছে। দেখা হবার পর ওদের সৌজন্য আলাপ হয়। লতিফ নিজে এসে ওর সাথে গল্প করে। তারপর প্রায় তিনমাস পর আবার দু'জনার দেখা। মার্চ মাসের তীব্র গরমে আয়না যখন ঘেমে নেয়ে উঠে দ্রুত পায়ে রাস্তা পার হচ্ছিল, ঠিক তখন ওদের আবার দেখা। লতিফ বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে একপ্রকার জোর করেই আয়নাকে বাসে তোলে। তারপর গরমে গাড়ি

ভর্তি লোকের ভিড়ে চিড়েচ্যাপটা হতে-হতে লতিফ আয়নাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেলে। আয়নার কপাল বেয়ে তখন ঘামের স্রোত নামছে। একহাতে ঘাম মুছে কপাল কুঁচকে সামনে দাঁড়ানো ত্রিশ বছর বয়সি যুবকের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির সুদর্শন যুবক মুহূর্তেই তার মনে আকর্ষণের জন্ম দেয়। তারপর দুই পরিবারকে জানিয়ে, তাদের নিয়েই পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়ে যায়।

তারপর পাঁচটা বছর পেরিয়েছে। সংসার জীবনের সুখ এবং অসুখ দুটোই তাদেরকে ছুঁয়ে গেছে। সেই সাথে ভেঙে পড়েছে কিছু সূক্ষ্ম অনুভূতির দেয়াল। দেয়ালের ওপাশের দৃশ্যটা ঠিকঠাক মনঃপূত না। দেহ থেকে মাংস ছাড়ালে যেমন কঙ্কাল বেরোয়, তেমনভাবে সম্পর্কের ভেতরে যে অনুভূতির দেয়াল থাকে তা ভাঙলে একটা নতুন কাঠামো চোখে পড়ে। যা সবসময় প্রীতিদায়ক হয় না। এই দৃশ্য প্রায় সময় চোখ জুড়ানোর বদলে চোখে ঘা বানিয়ে দেয়।

আয়না এখন দুই সন্তানের জননী। বড় ছেলের নাম রাজ। বয়স সতেরো মাস। তারপর গতমাসে তার একটা মেয়ে হয়েছে। মেয়েটার নাম রোজ। এখন মেয়েটা নিউমোনিয়াতে ভুগছে। দুই সন্তানকে নিয়ে আয়নাকে রীতিমত লড়াই করতে হচ্ছে। কিন্তু এইসব লড়াই তাকে তীব্র কষ্ট দিত না, যদি তার পাশে বুক আগলে লতিফ দাঁড়িয়ে থাকত। অগত্যা সব ঝড় একসাথে আয়নাকেই উলট-পালট করে দিয়ে যাচ্ছে।

আয়না কল থেকে হাতমুখ ধুয়ে ঘুমন্ত ছেলেটাকে দেখতে যায়। সে চাইলেও রাজকে রাতে কাছে রাখতে পারে না। রোজের ধারেকাছে থাকাটা মোটেই সহ্য করতে পারে না রাজ। মেয়েটাকে ঠিকমত খেতেও দিতে চায় না। এদিকে মেয়ে যে দুই সন্তানকে কাছে রাখতে গিয়ে শুকিয়ে কাঠ হচ্ছে সেটা আরেক মায়ের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তাই আয়নার মা রাজিয়া বেগম রাজকে রাতে নিজের কাছে রাখতে শুরু করেছেন। সেটা আলাদা একটা ঘর। ছেলেটা সারারাত কাঁদে। মায়ের দুধ খেতে চায়। রাজিয়া বেগম বিস্কুট, কেক, পানি এসব হাতের কাছে রাখেন। পাশের ঘরে শুয়ে আয়নাও দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না। বুকের ভেতরে টনটন করতে থাকে। শেষরাতের দিকে ছেলের কান্না ঝিমিয়ে আসে, সেই

সাথে তারও চোখ বুজে আসে। পাশাপাশি দুটো ঘরে শুয়ে দুই মা মেয়ের লড়াই চলে। এ বড় ক্লান্তিকর লড়াই। রাত যেন ফুরাতেই চায় না।

আয়না ছেলের কপালে হাত দিয়ে দেখে। তারপর কপালে একটা আলত চুমু খায়। রাজ নড়ে ওঠে, পাশ ফিরে মায়ের ওড়নার একপ্রান্ত মুঠো করে ধরে আবার ঘুমে ডুবে যায়। আয়না ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর আর ছেলের স্নিগ্ধ মুখখানা পরিষ্কার দেখতে পায় না। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। মনে হয় একটা দমকা বাতাসের সাথে অস্পষ্ট কিছু ব্যথা এসে তার চোখেমুখে লেপটে গেছে।

আয়নারা পাঁচ ভাইবোন। আয়নাই সবার বড়। তারপর জীবন, সে এবার এইচএসসি পাশ করেছে। দরিদ্র সংসারের হাল ধরতে চাকরির চেষ্টা করছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক আগে একটা চাকরি হয়েছে। প্রজেক্টের চাকরি। বেতন কম, কিন্তু তার জন্য ওটাই আশার আলো। তারপর জমজ দুই বোন জিনি আর চিনি। ওরা এসএসসি পাশ করেছে। দুজনেই মেধাবী ছাত্রী। এ+ পেয়েছে। সবার ছোট তিন্নি, তার বয়স বারো বছর। সে জন্মগতভাবে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী। ঠিকমত হাঁটতে, কথা বলতে, খেতে পারে না।

ওদের বাবা খালেদ শিকদার একজন কৃষক। নিজের পৈতৃক ভিটা আর মাঠের সামান্য জমিকে কেন্দ্র করেই সংসার জীবন চলতে থাকে। সুখে-দুঃখে দুটো ডালভাত আর সন্তানদের জন্য খাতা-কলম কেনাই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেখানেও চাহিদার তুলনায় ঘাটতি প্রকট। কিন্তু তিনি হতাশ নন। উপরে বসে থাকা সর্বশক্তিমানের উপর তার দৃঢ় আস্থা। তিনি বিশ্বাস করেন, খোদার কৃপায় একদিন দিন বদলাবেই...।

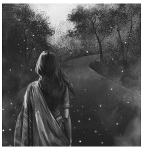

আয়না মায়ের কাছে রান্নাঘরে এসে বসে। রাজিয়া বেগম তখন তরকারি কাটতে ব্যস্ত। এর ফাঁকে ভাতের হাঁড়ি থেকে উপচে পড়তে চাওয়া ফেন তুলছেন। মেয়ের মলিন মুখটার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'কী এত চিন্তা করিস মা? ভাবিস নে। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখিস।'

আয়না দীর্ঘশ্বাস ফেলে মায়ের ব্যস্ত হাতের দিকে তাকায়। কোনো জবাব দেয় না। মা হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, 'লতিফ কল করেনি আর?'

আয়না না সূচক মাথা নাড়ে। তারপর মৃদু স্বরে বলে, 'হয়ত ব্যস্ত আছে। দেবে সময় করে।'

মা কিছুটা আশ্বস্ত হন। কিন্তু আয়না মুখে যাই বলুক, নিজে মোটেই আশ্বস্ত হতে পারে না। তবে তা তো আর মাকে বলা যায় না! এমনিই দরিদ্রতা এসে এই সংসারের ছাল-চামড়া সব তুলে ফেলছে। ঘরের ফাঁকফোকর দিয়ে অবিরত বাতাসের মত করে দুশ্চিন্তা প্রবেশ করে। এরপরে সে আর চিন্তা বাড়িয়ে দিতে পারবে না। না, এতটা নিষ্ঠুর সে নয়।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে উদাস মনে বাড়ির পাশের বহমান নদীর পাড়ে চলে আসে আয়না। এটা তার সবচে' প্রিয় জায়গা। নদীটার নাম কাজলা নদী। নামের মত নদীর চেহারাটাও সরেস। তখন আকাশের বুকে ফুটে ওঠা ফুলের মত সূর্যটা আলোকিত হয়ে ওঠে। ঝিক করে ছুরির ফলার উপর আলো পড়ার মত করে চারদিকটা চিকচিক করে ওঠে। সেই সাথে জনপদে নতুন করে সাড়া জাগে।

আয়না বালি জমা নদীর পাড়ের দিকে তাকায়। তাকিয়েই চমকে ওঠে। দেখতে পায়, হাঁটু সমান পানিতে বসে তাদের প্রতিবেশী তরিকুলের বউ নাফিজা গলায় একটা মাটির কলসি বাঁধছে। সে চিৎকার করে ওঠে। আচমকা চিৎকারে বউটাও চমকে ওঠে। বউটা দড়ি বাঁধা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, আয়নার দিকে মলিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আয়না দ্রুত বলে, 'কী করছ ভাবি? উপরে উঠে আস।'

বউটা না না বলে বারকয়েক মাথা দোলায়, তারপর আবার নিজের কাজে লেগে পড়ে। আয়না বুঝতে পারে সে কাঁচা সেলাই নিয়ে দৌড়ে ঘাটে নামতে পারবে না, ঘাটটা বেশ নিচু। ভাবল জোরে ডেকে লোক জড়ো করবে। কিন্তু এই সকালে কেউ ডাক শুনবে তো! আর